রাজশেখর বসুর অপবিজ্ঞান : বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যা

রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) বিদ্যাগত ও পেশাগত কারণে বিজ্ঞান শাখার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। কর্মগত বিষয়ের প্রেরণা তাঁর 'রাজশেখর বসু' নামক লেখক সত্তার সাথে এমনভাবে মিশে ছিল, যাতে তাঁর 'পরশুরাম' সত্তাটিকে ভিন্নসত্তা বলে মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যেমন রসায়নশাস্ত্রের সঙ্গে বাঙালির ব্যবসায়িক প্রচেষ্টাকে মিলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছেন, তেমনই রাজশেখর বসু রসায়নের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন সাহিত্যরসকে, এর ফলে বাংলা সাহিত্য পেয়েছে অনাস্বাদিত এক নতুনতর সৃষ্টি। রাজশেখর বসু দু'ধরনের রসায়নের কারবারি ছিলেন; প্রথমটি, যে রসায়ন নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক জটিল-তাপূর্ণ গবেষণাগারের চর্চার বিষয়, এবং দ্বিতীয়টি, সেই নবরসের একটি — হাস্যরস যা মূলত মনের স্ফূর্তির উপাদান বলা চলে। রাজশেখর বসু সচেতনভাবেই তাঁর সৃজনের ক্ষেত্রে 'রাজশেখর' সত্তা ও 'পরশুরাম' সত্তাকে পৃথক রাখতে চেষ্টা করেছেন এবং স্বাভাবিক নিয়মেই তিনি সফলও হয়েছেন। তাঁর 'বিচিন্তা', 'লঘুগুরু' কিংবা রামায়ণ ও মহাভারতের সারানুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থের আঙ্গিকের সঙ্গে 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন' কখনই এক বলা যায় না।

রাজশেখর বসুর বি. এল. ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও তিনি আইন ব্যবসায় মনোনিবেশ না করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস'— এ রাসায়নিকের পদে যোগ দিয়েছিলেন এবং আজীবন সেখানেই কাজ করে গেছেন। এখান থেকেই স্পষ্ট হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ থেকে যিনি ১৯০০ সালে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর জীবনে বিজ্ঞান কতটা জায়গা জুড়ে অবস্থান করতে পেরেছিল। তারই প্রতিফলন ধ্বনিত হয়েছে রাজশেখরের কলমের আঁচড়ে।

রাজশেখর বসুর 'বিচিন্তা' গ্রন্থের 'অপবিজ্ঞান' নিবন্ধটি আমাদের বর্তমান আলোচনা- পর্যালোচনার বিষয়। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ রাজশেখরের হাত ধরেই এল- এমন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো ~~প্রবন্ধকারী~~ সাহিত্যিক যেমন বিজ্ঞান নিয়ে তাঁদের ভাবনার লিপিবদ্ধকরণ করেছিলেন, তেমনই আবার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সহ আরও বিশিষ্ট বাঙালি ~~মনস্বী~~ বৈজ্ঞানিক তাঁদের স্বাধীন চিন্তা-চেতনার প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধে। বলা যেতে পারে, এটি সেই সময়ের একটি শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞান চেতনার প্রয়াস সাধনের একটি আশিদপূর্ন প্রথম অধ্যায়। বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত থাকা রাজশেখর বসুকে ও সেই ধারার থেকে একটি স্রোত রূপে চিহ্নিত করা চলে। রাজশেখর বসুর প্রয়াস সেই মূল ধারার থেকে সম্পূর্ন বিচ্যুত বলা যায় না।

—নিবন্ধকার রাজশেখর বসুর 'অপবিজ্ঞান' নিবন্ধে উদাহরন সহযোগে আলোচনাপূর্বক আমাদের সমাজে প্রচলিত শিক্ষিত- অশিক্ষিত ভেদে বয়ে চলা কতকগুলি বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছেন এবং সেইসব প্রচলিত ভ্রান্তি দূর করার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব ও বিচারযোগে বৈজ্ঞানিক মতামত দিয়েছেন। প্রবন্ধের শুরুতেই রাজশেখর বসু অতিরিক্ত সংক্ষেপে এই প্রবন্ধটি লেখবার কারন নির্দেশ করে বলেছেন,

> -বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধসংস্কার ক্রমশ দূর হইতেছে, কিন্তু যাহা যাইতেছে তাহার স্থানে নতুন জঞ্জাল কিছু কিছু জমিতেছে, -ধর্মের বুলি লইয়া যেমন অপধর্ম সৃষ্টি হয়, তেমনি বিজ্ঞানের বুলি লইয়া অপবিজ্ঞান গড়িয়া ওঠে। সকল দেশেই বিজ্ঞানের নামে অনেক নূতন ভ্রান্তি সাধারনের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশে যে সকল ভ্রান্ত ধারনা এদেশে লোকপ্রিয় হইয়াছে, তাহারই কয়েকটির কথা বলিতেছি।

—'অপ' একটি উপসর্গ, যার অভিধানগত অর্থ হল প্রতিকূল, কুৎসিত, মন্দ, ভ্রান্ত। অপ উপসর্গ যোগে বিজ্ঞানের ভ্রান্তিযুক্ত দিককে তুলে ধরতে চেয়েছেন রাজশেখর, তাই তাঁর প্রবন্ধটির নাম 'অপবিজ্ঞান'। এই প্রবন্ধেই রাজশেখর বসু নির্দেশ করেছেন, বিজ্ঞানের কাছ থেকে

অপেক্ষাকৃত সরল করা। রাজশেখরের এই বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের ভাষাও তাই অনেকাংশে সহজ ও সরল। বৈজ্ঞানিক জটিলতা ও পারিভাষাকে তিনি অনেকাংশে বাদ রেখে সাধারনের উপযোগী ভাষায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমের ক্রমবিন্যাসে। কিন্তু ক্ষেত্রে স্বভাবসিদ্ধ পরশুরামের রম্য রসের ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভারবহুল আলোচনায় সরসতার সঞ্চার ঘটিয়েছেন পরম স্বাতন্ত্র্যে।

প্রবন্ধের প্রথমাংশে এসেছে বিদ্যুৎজনিত অপবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ। লোহা ও তামা বিদ্যুতের সুপরিবাহী ধাতু, তাছাড়া ব্যাটারিতে দুই রকম ধাতু থাকে বলে তা থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় – এ তথ্য সাধারন মানুষ জানে। বিজ্ঞান-জনিত এই তথ্যের উপর নির্ভর করেই তারা বৈদ্যুতিক মালসা, বৈদ্যুতিক আংটি কিংবা অষ্টধাতুর দ্রব্যাদি নির্দ্বিধায় গ্রহন করে এক ভ্রান্ত উপযোগিতা মনে মনে বহন করে। বিজ্ঞানের তথ্যের সঙ্গে ভ্রান্তির সংযোগে আরও অনেক বড় কুসংস্কার দৃঢ়মূল হয়ে যায়।

শাস্ত্রমতে, উত্তর দিকে মাথা রেখে ঘুমালে জীবের অমঙ্গল হয়, লোককথায় এ নিয়ে কিছু গল্পও প্রচলিত আছে। শাস্ত্রকে কোনো ব্যাখ্যাযোগ্য কারনের সন্ধান দিতে হয় না বলেই, এক্ষেত্রে একটি বৈজ্ঞানিক সংযোগ সাধনের প্রচেষ্টা হয়েছে। পৃথিবী নিজে একটি চুম্বক – একথা বিজ্ঞানসিদ্ধ। এ সূত্রেই আবর্তিত হতে শুরু করেছে একটি জটিলতা। মনে করা হয় মানুষের শরীরও চুম্বকধর্মী, তাই তার চৌম্বকশক্তি বজায় রাখতে নাকি উত্তর দিকে মাথা রাখা নিরাপদ নয়, কিন্তু দক্ষিন দিকে ঠিক কী কারনে এ কর্মটি সম্পূর্ন নিরাপদ, তারও কোনো ব্যাখ্যা অপবিজ্ঞান দিতে অক্ষম। প্রত্যেক প্রানীদেহেই অল্পবিস্তর ফসফরাস আছে, এবং এই মৌলটি প্রানীদেহে যৌগিক অবস্থায় থাকে। এই ফসফরাস যখন মৌলিক অবস্থায় থাকে, তখন তা বায়ুর স্পর্শমাত্র জ্বলে ওঠে এবং তার ফলে আলোর সৃষ্টি হয়। এই ফসফরাস বিষ। বিজ্ঞানের এই তথ্যসূত্রে লোকসমাজে প্রচলিত একটি ভ্রান্ত ধারনা রয়েছে, জোনাকির শরীরে প্রচুর পরিমানে ফসফরাস থাকার জন্য তার শরীর থেকে আলো নির্গত হয়, তাই দগ্ধ জোনাকির ধোঁয়া বিষাক্ত। রাজশেখর এই ভ্রান্তির বিরুদ্ধে ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন প্রত্যেক প্রানীদেহেই যে ফসফরাস যৌগ অবস্থায় আছে, তার

মধ্যে বিষবস্তু নেই। জোনাকি অপেক্ষা এবং টিকরো মাছে অনেক বেশি পরিমানে সেই ফসফরাস বিদ্যমান। মাছপোড়া যেমন নিরাপদ, জোনাকি পোড়াও তেমনই নিরাপদ।

—কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক শব্দ ও নামের মধ্যে সম্মোহিনী শক্তি থাকে, সাধারন অবৈজ্ঞানিক মানুষ সেইসব শব্দ বা নাম আয়ত্ত করে যথা ইচ্ছা ব্যবহার করে ভ্রান্তির সূচনা করে। এমনই একটি মুখরোচক শব্দ 'গাটাপার্চা'; এই গাটাপার্চা হল রবারের মতো একধরনের গাছের তরলক্ষীর বা আঠা, এর থেকে বৈদ্যুতিক তারের আবরন, বার্নিশ, চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত দাঁত ইত্যাদি তৈরি হয়। অথচ সাধারন মানুষ ফাউন্টেন, চিরুনি, চশমার ফ্রেম ইত্যাদি বস্তুর উপাদানকে গাটাপার্চা বলে। এটি একটি ভুল প্রয়োগ। এমনই আরেকটি ভুল প্রয়োগের শিকার হয়েছে 'সেলিউলয়েড' শব্দটি, সেলিউলয়েড কাচের মতো স্বচ্ছ এবং এটি তৈরি হয় নাইট্রিক অ্যাসিড, তুলা ইত্যাদি দ্রব্যের মিশ্রনে। এটি দিয়ে বহু উপাদান নির্মান করা হয়। অথচ ভুলক্রমে সেলিউলয়েড নয় এমন স্বচ্ছবৎ কৃত্রিম পদার্থও এই নামে প্রচলিত হয়ে চলেছে। রবারের সঙ্গে গন্ধকের মিশ্রনে তৈরী হয় ইবনাইট বা ভলকানাইট, এর বাংলা নাম কাচকড়া। এই কাচকড়া থেকে ফাউন্টেন পেন, চিরুনি তৈরি হয়। নকল রেশম, নকল হাতির দাঁত, নানারকম বার্নিশ, বোতাম প্রভৃতির উপাদান ও প্রস্তুত নামের প্রনালী ভিন্ন। অথচ বাজারে সেলোফেন, ভিসকোজ, গ্যালালিথ, ব্যাকেলাইট প্রভৃতি নাম এই সমস্যার শিকার। এমনই এক ভ্রান্তিকর নাম— আলপাকা শাড়ি। আলপাকা শাড়িতে পশমের লেশমাত্র নেই, এটি কৃত্রিম রেশমজাত শাড়ি। অথচ আলপাকা কথাটির অর্থ পশমী কাপড়! এমনই একটি অপপ্রয়োগ ঘটে টিন শব্দটির ব্যবহারে। টিন শব্দের প্রকৃত অর্থ হল রাং, কিন্তু রাং দেওয়া যে কোনো লোহার পাত, বা সেই পাত থেকে তৈরি হওয়া আধার কিংবা ঘর ছাউনি দেওয়ার দ্রব্যকেও এমন টিন বলা হয়। এটি কোনো ভাবেই শব্দটির যথার্থ ব্যবহার নয়, অথচ লোকপ্রচলিত শব্দটি আজও অক্ষুন্ন রয়ে গেছে।

—মনোবিদ্যার আঙিনা থেকে প্রাপ্ত দুটি পরিভাষা— mo... ও Complex এই ধরনের অপপ্রয়োগের শিকার হয়েছে, পরশু বিরোধিতায় রাজশেখর এ সম্পর্কে প্রবন্ধে বলেছেন,

বিজ্ঞানীর দুর্দৈব – তিনি মাথা ঘামাইয়া যে পরিভাষা রচনা করেন সাধারণে তাহা কাড়িয়া লইয়া অপপ্রয়োগ করে, এবং অবশেষে একটা বিকৃত কদর্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বিজ্ঞানীকে অধিকার-চ্যুত করে।

লেখকের বক্তব্যানুসারে, এই যে অন্ধ বা পরিভাষার অপব্যবহার দিনের পর দিন ঘটে চলেছে এবং সেই ঘটে চলাটা এমনই বেশি যে, তার বিরোধিতা করাও যেন দুষ্কর। রাজশেখর এর কারণ রূপে নির্দেশ করেছেন অপবিজ্ঞানকে।

—বিজ্ঞানের লক্ষ্যই হল জটিলকে সহজ করে তোলা, বহু বিচ্ছিন্ন ব্যাপারের মধ্যে সংযোগ সন্ধান করা। বিজ্ঞান নির্ধারণ করে দুটি পৃথক ঘটনার মধ্যে অখণ্ডনীয় সম্বন্ধকে। কিন্তু সেই ঘটনাটি ঠিক কোন হেতুবশত ঘটে, তার চূড়ান্ত জবাব বিজ্ঞানের অজ্ঞাত। যেমন – জড়বস্তুর পারস্পরিক আকর্ষণ দেখে বিজ্ঞানী নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন Law of gravitation, মহাকর্ষের নিয়ম; কিন্তু এই আকর্ষণটি কেন ঘটে তার কোনো হেতুর উল্লেখ নেই। এমন একটা সহজ দৃষ্টান্ত সহযোগে তিনি বলেছেন,

মানুষ মাত্রই মরে ইহা অবধারিত সত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম, মানুষের এই ধর্মের নাম মরত্ব। কিন্তু মৃত্যুর কারণ মরত্ব নয়।

রাজশেখর বসুর 'অপবিজ্ঞান' নিবন্ধে ভাষা ব্যবহারের মধ্যে যেমন পর্যাপ্ত তথ্য আছে, তেমনই সাধারণ ভুলের অজ্ঞতা ও অন্ধসংস্কার নিয়ে বক্রোক্তিও আছে পর্যাপ্ত। দৃষ্টিভঙ্গিতেও রাজশেখর বসু যথেষ্ট বিজ্ঞান সচেতন ও সংবেদনশীল মনের অধিকারী। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চাকারী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কিংবা জ্ঞানদানন্দ রায়ের সার্থক উত্তরসূরী রাজশেখর বসু। রচনাটির প্রাসঙ্গিকতা একবিংশ শতাব্দীতেও খুব বেশি — একথা বললেও হয়তো অত্যুক্তি হয় না। সামগ্রিক বিচারে 'অপবিজ্ঞান' প্রবন্ধটি রাজশেখর বসুর গভীর প্রজ্ঞা, মনীষা, স্বাতন্ত্র্য ও মুক্ত চিন্তার স্মারক।